এই সময়

* কথাসরিৎ *

আগেকার চেয়ে ঢের মশামাছি মোসাহেব বেড়েছে এখন।
নদী কি বেড়েছে একটিও? অথবা পাহাড়।

— পূর্ণেন্দু পত্রী

সাবাশ

গণপরিবহণ পরিষেবার উন্নতির ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী? পুরুষদের এ প্রশ্ন করলে অধিকাংশই উত্তর দেবেন সময়ানুবর্তিতা। একই প্রশ্ন মহিলাদের করা হলে যদি অধিকাংশের উত্তর হয় 'নিরাপত্তা', তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গণপরিবহণে মহিলাদের যৌন হেনস্থা কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু হরিয়ানার রোহটাকের একটি বাসে কলেজ ছাত্রী দুই বোন যে ভাবে তাঁদের হেনস্থাকারীদের রীতিমতো প্রহার করেছেন আশা করা যায় তা পথে ঘাটে যৌন আক্রমণের স্বীকার হয়েও তা নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার দীর্ঘকালীন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে। একই সঙ্গে এও আশা করা যায় যে, এই বিষয়টি নিয়ে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের নীরবতার এ বার অবসান ঘটবে। ভারতে তো বটেই বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশেও গণপরিবহণ ব্যবহার এক বিপুল সংখ্যক মহিলার কাছে রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে লন্ডনে গণপরিবহণ ব্যবহারকারীদের ৩২ শতাংশ কোনও না কোনও সময়ে যাতায়াতের পথে অন্তত এক বার যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন। বিশ্বের ১৬টি শহরে অতি সম্প্রতি চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে মস্কো বা প্যারিসেও মহিলারা গণপরিবহণে যৌন হেনস্থার শিকার হন। অবশ্য এগুলির মধ্যে যে চারটি শহরের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক তার মধ্যে রয়েছে দিল্লি। রাষ্ট্রপুঞ্জের ও একটি এনজিও-র যৌথ ভাবে চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দিল্লির ৮৫.৪ শতাংশ মহিলা মনে করেন যে, শহরের বিভিন্ন গণব্যবহার্য স্থানে ও পরিষেবায় মহিলাদের যৌন হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়, এর মধ্যে একটি বড়ো অংশ শহরের গণপরিবহণকে নিরাপদ মনে করেন না।

তিক্ত বাস্তব এটাই যে প্রায় প্রতিনিয়ত এই যৌন হেনস্থাকে প্রায় নীরবেই মেনে নিতে বাধ্য হন মহিলারা কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখের সামনে এই অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেও অন্যান্যরা কখনও প্রতিবাদ করেন না। এই বাস্তব যে অস্বস্তিজনক সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা হল এই অপরাধের বিষয়ে সমাজ উদাসীন এবং শুধু উদাসীনই নয় বিশেষত পুরুষদের অনেকেই মনে করেন মহিলাদের সাজ-পোশাকের সঙ্গে যৌন হেনস্থার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। অর্থাৎ পরোক্ষে একটি পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অনুশীলন মহিলারা মেনে চলতে বাধ্য। যারা তা মানেন না শাস্তি হিসেবে তাঁদের যৌন হেনস্থা ভোগ করতে হয়। কোনও সভ্য আধুনিক সমাজে এই পরিস্থিতি অনন্তকাল চলতে পারে না। এর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি বড়ো ভূমিকা আছে। ২০১২ সালে ভারতে গণপরিবহণে মহিলাদের যৌন হেনস্থা বন্ধ করতে সুপ্রিম কোর্ট একটি দীর্ঘ নির্দেশাবলী জারি করে। অথচ কোনও রাজ্যেই আদালতের এই নির্দেশগুলি মানা হয় না। বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সমাজের নাগরিক সমাজের নীরবতার ফলেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির পক্ষে আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করা সহজতর হয়। আশা, রোহটাকের দুই কলেজ ছাত্রীর সাহস সমাজের সর্ব স্তরে সঞ্চারিত হয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার করবে।

প্রত্যাঘাত

মহা-সাহিত্যিকের সেই যে বহুশ্রুত উক্তি, নামে কী-ই বা আসে যায়! তামাদি হল বলে। অন্তত তাঁর জন্মভূমির যা ভাবগতিক, তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। একটি বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২০১৪ সালে ব্রিটেনে সদ্যজাত শিশুর নামকরণের সেরা একশোর তালিকায়, ভারতীয় 'আরভ' নামটি, হুহু গতিতে একেবারে শীর্ষ স্থানের দিকে ধাবমান। মহম্মদ যদিও শীর্ষেই রয়েছে, কিন্তু 'আরভ'-এর জনপ্রিয়তা নজরকাড়া তো বটেই, চমকপ্রদ-ও। তবে চমক সেখানেই থেমে না থেকে, আরও এক কাঠি বেড়েছে, 'জর্জ' নামটির নাকি সাংঘাতিক অধঃপতন ঘটেছে। অতীতে রাজপরিবার বা বিখ্যাত কোনও মানুষের নামে শিশুর নামকরণ, খুবই প্রচলিত এক কাণ্ড ছিল। সে সাড়া পৃথিবী জুড়েই। অতএব ব্রিটিশদের এ হেন অনীহা, তা-ও কী, রাজপুত্র জর্জ-এর জন্মগ্রহণের বছরখানেকের মধ্যেই! অন্য এক অর্থ বহন করে সম্ভবত। কিন্তু সেই সব চাপানউতোরের অদূরে পড়ে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাবনা। প্রশ্নও বটে। এই জর্জ বা অন্য যে কোনও পশ্চিমি নামকে অনায়াসে, খোদ পশ্চিম ভূখণ্ডেই, টেক্কা দেওয়া কি এক প্রকার উপনিবেশের প্রত্যাঘাত নয়? পাল্টা মার, স্রেফ পেশিশক্তির জোরেই নয়, সুচতুর কৌশল অবলম্বন করেও বা হয়তো।

হ্যাঁ, অবশ্যই, মহম্মদ বা আরভ-এর মতো নামের সাড়া জাগানো জনপ্রিয়তা, ব্রিটেনের বহুবর্ণময়, বহুজাতি-সংবলিত সংস্কৃতির উদাহরণ। এবং অত্যন্ত সফল সে যাপন। কিন্তু এ-ও তো ঘোর বাস্তব যে, এক কালের নিপীড়িত, শোষিত মানুষ আজ অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থার একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন তাঁরাই মূল নিয়ন্ত্রক। বাজারও এখন তাঁদের অঙ্গুলিহেলনে চলে। আর মুখ চেয়ে অপেক্ষারত, পূর্বতন মহারাজ। আই পি এল দেখিয়ে দিয়েছে তার তাকত, সেই শুরুর দিন থেকেই। তথাকথিত 'ওরিয়েন্ট', নিমেষেই শ্বাসরোধ করেছিল সাদা চামড়ার আধিপাত্য, তার প্রবল দাপট। আর শুধু আই পি এল-ই বা কেন, যে দেশকে ক্রিকেটের আঁতুড় ঘর রূপে জানা ছিল, এশীয় দেশগুলোর অনবদ্য প্রায়-চিরন্তন কীর্তির ফলে, সেই আঁতুড় ঘরের ঠিকানাই যেন ঘেঁটে গেল। এক কালে তো বহু চর্চা হয়েছে, শুধু মাত্র বুঝতে, যে 'স্যাভেজ' কি আদৌ কোনও কথা বলতে পারে? কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, ঠিক সেখান থেকেই এমন বাণ ছিটকে আসছে একের পর এক, যে পূর্বতন ভাবুকসকল অভাবনীয় রকম পর্যুদস্ত। সেখানেই থেমে না থেকে, উপনিবেশ এমন কাণ্ডও জুড়ল, যা 'প্রভু'-র অভ্যন্তরে আঘাত হানল। এই যেমন চিকেন টিক্কা মশালার মতো নিখাদ ভারতীয় খাদ্যকেও যখন ব্রিটিশ সভ্য ইংল্যান্ডের জাতীয় খাবার হিসেবে আখ্যা দেন, তখন উপনিবেশের ষোলো কলা যে পূর্ণ, খুব বোঝা যায়। আরভ-এর মতো নামের জনপ্রিয়তা, একটি ছোটো ইঙ্গিত সেই পালাবদলের। তবে, এই তীব্র হানাহানির কালে, আরভ, যার অর্থ, শান্তিপূর্ণ, বিশেষ এক মানেও তো বহন করে, সে মানে বোঝার যে কী প্রয়োজনীয়তা, তা-ই তো বুঝে ওঠা হল না। খেদ।

* অসংখ্যা *

৩৮০০০০০০

(তিন কোটি আশি লক্ষ)— বিশ্বের সব থেকে জনবহুল শহর টোকিও-র জনসংখ্যা।

* দিনকেদিন *

৪ ডিসেম্বর

১৭১৭: সার্জন উইলিয়াম হ্যামিলটন প্রয়াত হন।
১৮২৯: লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করেন।
১৮৬৯: ইন্দুমাধব মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৮৮: রমেশচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৬১: ইয়ুরি গ্যাগারিন কলকাতায় পদার্পণ করেন।

ভোপালে ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট ছিল না, সরকারও মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দেখিয়েছিল

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ক্ষত ধরা আছে তাঁর অমোঘ ছবিতে। তিন দশক আগের সেই স্মৃতি, তার সঙ্গে নগর কলকাতার আরও বেশ কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে একান্ত আলাপে আলোকচিত্রী **পাবলো বার্থলোমিউ**। কথা বলেছেন **অভিজিৎ সেন**

মধ্য সত্তর থেকে নব্বইয়ের শেষ, এই তিন দশক তিনি ক্যামেরা কাঁধে ছুটেছেন খবরের পিছনে। তাঁর তোলা ছবি প্রকাশিত হয়েছে লাইফ, ল্য ফিগারো, জিও, স্টার্ন, ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিকের মতো পত্র-পত্রিকায়। একাধিক বার পেয়েছেন ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো পুরস্কার। ওই সংস্থার জুরির অন্যতম সদস্যও হয়েছেন দু'বার। তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিস, নিউইয়র্ক, সুইটজারল্যান্ডের সেন্ট মোরিত্জ, ঢাকায় এবং আরও বহু জায়গায়।

কিন্তু পাবলো বার্থলোমিউকে আমজনতা মনে রেখেছেন ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার সেই অনন্য ছবির জন্য যেখানে ধরা ছিল এক সদ্যোজাতকে কবর দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটি। তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনী 'দ্য ক্যালকাটা ডায়েরিজ' উপলক্ষে পাবলো এসেছিলেন কলকাতায়।

তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এল ভোপাল, কলকাতা, তাঁর মা-বাবা, আরও নানা প্রসঙ্গ।

অভিজিৎ সেন: ২০১৪-য় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা তিরিশ বছরে পড়ল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কী ভাবে ফিরে দেখেন ভারতের বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনাকে?

পাবলো বার্থলোমিউ: ঘটনার দিন আমি ভোপালে ছিলাম না। সেই সময় গামা-লিয়েজঁ নামে এক বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ-আমেরিকান ফটো এজেন্সির হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযানের ছবি তুলছিলাম। ১ ডিসেম্বর পাটনা পৌঁছোই। তিন তারিখ সকালে বিবিসি রেডিয়োতে শুনি, 'ভোপালের কারখানায় গ্যাস লিকে মৃত ৩০।' কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা মতো বিমানে পাটনা থেকে লখনউ চলে যাই। আমার গন্তব্য ছিল অমেঠি, যেখানে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন নেহরু-গান্ধী পরিবারের 'অবাধ্য' পুত্রবধূ মানেকা গান্ধী। মানেকার সভা ছিল সুলতানপুরে। সেখানে যাওয়ার পথে একটা ধাবায় বসে খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ চোখ গেল ছোটো সাদা কালো টিভির পর্দায়। ভোপালের হাসপাতালে রাখা ঠেলাগাড়িতে তোলা হচ্ছে একটার পর একটা মৃতদেহ। বিবিসিতে শুনলাম 'ভোপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০০।' আর দেরি করিনি। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে এলাম লখনউ। প্লেনের টিকিট পেলাম না। সেই সময় প্লেনেও শহরভিত্তিক কোটা থাকত। তাই ট্রেনে চেপে আগ্রা, সেখানে থেকে গাড়িতে গোয়ালিয়র। অবশেষে, ৫ তারিখে হপিং ফ্লাইটে ভোপাল। প্রায় দু'সপ্তাহ ছিলাম সেখানে। ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা, জে পি নগরের বস্তি, বিভিন্ন হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন, শ্মশান, গোরস্থান, যেখানেই যাই, শুধু মৃতদেহের সারি। আর যাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন, তাঁদের চোখ, ফুসফুস আর ত্বক ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। মিথাইল আইসোসায়ানেটের বিষক্রিয়ায় নষ্ট হল এই নরম টিসুগুলোই।

আর সেই হতভাগ্য শিশুটি?

তার ছবি তুলেছিলাম এক মুসলিম গোরস্থানে। তখন ক'টা হবে, সকাল এগারোটা। সেই শিশুটি ছেলে না মেয়ে আমি আজও জানি না, জানতে চাইও না।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ইউনিয়ন কার্বাইড ১৯৮৯ সালে যে ক্ষতিপূরণ (৪৭০ মিলিয়ন ডলার) দেয় তা কী যথেষ্ট বলে মনে করেন?

কখনই নয়। বরং কেন্দ্র এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার কোম্পানির প্রধান ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে (সদ্য প্রয়াত) নির্বিঘ্নে ফেরার ব্যবস্থা করে। সরকার মৃতের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেখানোয়, ক্ষতিপূরণের অঙ্কটাও কমে যায়। অথচ দুর্ঘটনাস্থলে গেলে দেখবেন সাফাই ব্যবস্থায় এখনও বিস্তর গলদ। খোলা ট্যাঙ্কে আজও রাসায়নিক মজুত রয়েছে। তারই কিছুটা ভূমিজলে (গ্রাউন্ড ওয়াটারে) মিশে গিয়ে ছড়িয়ে যায়। সেই জল খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাদের অসুখ ঠেকাবে কে? একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা আবার খতিয়ে দেখলে মৃত এবং পীড়িত পরিবারগুলি সুবিচার পেতে পারে।

কী ভাবে ভোপালের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন?

এই ঘটনার প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম এবং বিংশতি বার্ষিকীতে আমি ভোপালেই ছিলাম। (গত মাসেই এই দুর্ঘটনা নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাসভায় আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন পাবলো)।

পাবলো বার্থলোমিউ

এ বার অন্য প্রসঙ্গে যাই। 'দ্য ক্যালকাটা ডায়েরিজ'-এর ভাবনাটা কী ভাবে এল?

দেখুন, যখন ছোটো ছিলাম, দিদিমার শর্ট স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে এসে বহু বার থেকেছি। এ বারের প্রদর্শনীতে আমার দিদিমাকে নিয়েই একটা পর্ব রয়েছে। যখন একুশ, তখন সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'র ইন্ডোর শ্যুটিংয়ের স্টিল ছবি তুলতে কলকাতা এলাম। যে দিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তেমন কাজ থাকত না, বেরিয়ে পড়তাম। ঘুরতাম কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। যোধপুর পার্ক, বউবাজার, ধাপা, অলিপাব। ট্যাংরার চায়নাটাউনেও প্রচুর ছবি তুলেছিলাম। তার কিছু নমুনা এই প্রদর্শনীতে পাবেন। থাকারও কোনও ঠিক ছিল না। কখনও গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউসে, কখনও বা নিউ কেনিলওয়ার্থে। আর একটা আস্তানাও ছিল। অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় তখন থাকতেন আয়রনসাইড রোডে, চার-কামরার এক বিশাল ফ্ল্যাটে। আমাকে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

> ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা, জে পি নগরের বস্তি, হাসপাতাল, স্টেশন, শ্মশান, গোরস্থান, যেখানেই যাই, শুধু মৃতদেহের সারি। সেই শিশুটির ছবি তুলেছিলাম এক মুসলিম গোরস্থানে। তখন সকাল এগারোটা। সেই শিশুটি ছেলে না মেয়ে আজও জানি না, জানতে চাইও না।

আর একটা কথা বলি। যতই মল আর ফ্লাইওভার হোক, এ গুলো কলকাতার আবরণ মাত্র। শহরটার ঔপনিবেশিক ইতিহাস তো আছেই। মনে হয় এই বুঝি সব ভেঙে পড়বে। কিন্তু পড়ছে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কত বছর ধরে এখানে বাস করছেন। এবং সমাজের মূলস্রোতে থেকেই। কলকাতার এই চরিত্রটাই আমার পছন্দ।

> যতই মল আর ফ্লাইওভার হোক, এগুলো আবরণমাত্র। কলকাতার ঔপনিবেশিক ইতিহাস তো আছেই। মনে হয় এই বুঝি সব ভেঙে পড়বে। কিন্তু পড়ছে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কত বছর ধরে এখানে বাস করছেন। এবং সমাজের মূল স্রোতেই বাস করছেন।

জয়ন্ত সাউ

প্রায় এক দশক আপনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য নিয়ে কাজ করেছেন। এই মুহূর্তে হার্ভার্ডে চলছে ওই অঞ্চল নিয়েই আপনার প্রদর্শনী 'কোডেড এলিগ্যান্স'? উত্তর-পূর্বাঞ্চল কী ভাবে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

দেখুন আমার বাবা রিচার্ড বার্থলোমিউয়ের জন্ম বার্মায় (মায়ানমার)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টিলওয়েল রোড ধরে তিনি মান্দালয় থেকে আসামের লিডোতে চলে আসেন। যে নাগাদের মনে করা হতো নরমুণ্ড শিকারি, তারাই বাবাকে আতিথেয়তায় ভরিয়ে দেয়। এ গল্প বাবার কাছেই শুনেছি। সেই থেকেই আমার ওই অঞ্চলের প্রতি আগ্রহ। পরে বাবা দিল্লিতে স্থিতু হয়ে দলাই লামা পরিচালিত টিবেট হাউস-এর কিউরেটর নিযুক্ত হন।

দেশের কোনও কোনও প্রান্তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ আজ আক্রান্ত হচ্ছেন। এর কারণ কি?

প্রথমেই বলব মূল ভূখণ্ডের মানুষজন এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আমরাই সেরা, এই বোধটাও কাজ করে। দু'পক্ষের ভুল ধ্যান ধারণাতেও বিভ্রান্তি ছড়ায়। পারস্পরিক আদান প্রদান বাড়ালে সমস্যা দুর হবে।

গত দেড় দশকে আপনার কাজে একটা দিক পরিবর্তন হয়েছে। কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নিলেন?

২০০০ সাল নাগাদ ঠিক করি, যে না, আর খবরের পিছনে ছোটা নয়। মনোমত কাজ এবং তার জন্য সঠিক অঙ্কের অর্থ পেলে তবেই নতুন প্রোজেক্ট আরম্ভ করি। তা ছাড়া রয়েছে নিজের ছবির সংরক্ষণের কাজ। নিজের কাজ নিয়ে বহু জায়গায় তিনটি বিষয় নিয়ে প্রদর্শনী করেছি, 'আউটসাইড ইন', 'ক্রনিকলস অফ আ পাস্ট লাইফ' এবং 'দ্য ক্যালকাটা ডায়েরিজ'।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসীদের নিয়েও কাজ করেছেন ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং মরিশাসে।

আগামী বছর যাচ্ছি পর্তুগাল। সেখানে গোয়া ছেড়ে এসে যে সব ভারতীয় বাস করেন, তাঁদের নিয়ে একটা সিরিজ করব। আমার কেবলই মনে হয় কেন মানুষ বার বার ভিটেমাটি ছেড়ে অজানা দেশে পাড়ি দেয়? শুধুই কি আর্থিক উন্নতির আশায়? যে সব ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা পানামা ক্যানাল বানিয়েছিল বা যে সব ভারতীয়রা চুক্তি শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা বা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল, তাদের সব হিসাব মিলেছিল কি?

আমার নিজের কথাই ধরি। আমার বাবা বার্মার। মা রতি বার্থলোমিউ পাঞ্জাবি-বাঙালি। এমন মিশ্র কুলপরিচয় নিয়ে নিজের মনেই অস্তিত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন ভিড় করে। তাই মায়ানমারেও যাব। শিকড়ের খোঁজে। আশির দশকেও দু'বার গিয়েছি। কিন্তু তখন সামরিক শাসন চলায় মানুষের চোখে ছিল সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

ষাট থেকে নব্বই ছিল পত্র-পত্রিকার স্বর্ণযুগ। আজ তাদের অনেকেই ধুঁকছে। কেন এমন হল?

সংবাদপত্র ও প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধাররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বোধ হয় প্রথমে বুঝতে পারেননি। বড়ো বেশি দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখা যেত অনলাইনে সব কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে অথচ প্রিন্টে কড়ি গুনতে হচ্ছে। আর বিজ্ঞাপন তো পরিযায়ী পাখি। যেখানে উপভোক্তা বেশি, সেখানেই গিয়ে বসবে। কপাল পুড়ল ম্যাগাজিনের।

এখন তো মোবাইলেই দিব্যি ছবি তোলা যাচ্ছে। সাধারণ ছবি তুলতে ক্যামেরাও লাগে না। কী বলবেন?

এ তো লেখার মতোই ব্যাপার। কেউ লেখে আবেদনপত্র, কেউ পরীক্ষাপত্র আবার কেউ কবিতা। মোবাইলের ক্ষেত্রেও তাই। সেটা একটা রেকর্ডিং যন্ত্র মাত্র। যা খুশি রেকর্ড করা যায়। যা ইচ্ছে তোলা যায়। কিন্তু তাতে ভাবনাচিন্তা কতটুকু? সেটা যে একটা নির্দিষ্ট খাতেই বইবে, তার অবশ্য কোনও মানে নেই।

* বোধিবৃক্ষ *

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই— এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গ-ত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ— অতএব, এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভরতি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু-কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু,—হায়রে! এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে— দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না। সে-যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল।

এক ছোট্টো সুখস্মৃতি

অক্সফোর্ডে নিখাদ বাঙালি আড্ডা। নিজগৃহে দ্যুতিমান, এবং অনর্গল **তপন রায়চৌধুরী**। স্মৃতিচারণে **মইদুল ইসলাম**

গত শুক্রবার সকালে খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী, বুধবার, ২৬ নভেম্বর রাতে, প্রয়াত হয়েছেন। খবরটা পড়ে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। চার বছর আগে বিলেতে, তপনবাবুর মতো এক প্রবাদপ্রতিম বাঙালির সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অক্সফোর্ড-এর ব্রেজনোজ কলেজ আয়োজিত 'ট্যানার' লেকচার শোনার পরে ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস রবিনসন-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন তোমার মতো কলকাতার এক বাঙালির তপনবাবুর সঙ্গে অবশ্য আলাপ করা উচিত। কিন্তু আমি তো এক ক্ষুদ্র গবেষক ছাত্র। কী করে যোগাযোগ করব? পরে অধ্যাপক রবিনসন-এর কাছে তপনবাবুর ই-মেল জোগাড় করলাম। তপনবাবুকে আমার পরিচয় দিয়ে ও অধ্যাপক রবিনসন-এর কথা বলে একটা ই-মেল করলাম। কিন্তু তার কোনও জবাব পেলাম না। তার পর এপ্রিল মাসে, ফয়সল দেভজি আয়োজিত অক্সফোর্ড-এর সেন্ট অ্যান্টনিজ কলেজের এক সেমিনার শুনতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে একেবারে আলাপ হয়ে গেল। কেমব্রিজ-এর ঐতিহাসিক, জয়া চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার শেষে চা পানের সময় কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। অভিজাত বাঙালিয়ানা আর ভদ্রতা কাকে বলে তখন টের পেয়েছিলাম। আমি বললাম, 'আপনার বাঙালনামা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু কখনও ভাবিনি যে এক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনার ই-মেল আমি ফ্রান্সিস রবিনসন-এর কাছে পেয়েছি।' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন 'আমি আমার পুরনো ই-মেলটা বিশেষ একটা দেখি না কারণ মাঝে মাঝে আরএসএস মার্কা কিছু লোকজন (ওঁকে) অনেক গালিগালাজ করে বার্তা পাঠায়।' তিনি উত্তর অক্সফোর্ড-এর বাড়ির ফোন নম্বর দিলেন আর বললেন যে এক দিন যোগাযোগ করে যেন ওঁর বাড়ি যাই। কিন্তু কিছুটা নিজের আলস্য আর কিছুটা গবেষণার কাজে ব্যস্ততার জন্য খুব শীঘ্র যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি।

অক্টোবর মাসে এক দিন সন্ধে, তপনবাবুর সঙ্গে রাস্তায়, বসওয়েলস নামক এক পুরনো বড়ো দোকানের সামনে দেখা হল। একটু লজ্জিত হয়েছিলাম যে চার পাঁচ মাস কেটে যাওয়ার পরেও ওঁকে ফোনে যোগাযোগ করিনি বলে। তার পর বন্ধু অর্ঘ্য সেনগুপ্তকে বললাম যে 'চলো এক দিন তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।' তার কয়েক দিন পর ফোন করে ৯ নভেম্বর অর্ঘ্যকে নিয়ে ওঁর বাড়িতে কথা মতো ঠিক সন্ধে ছ'টা নাগাদ হাজির হলাম। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন কী ভাবে ওঁর বাড়ি যেতে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্ভেজাল বাঙালি আড্ডা হয়েছিল। তিনি বললেন অক্সফোর্ড-এর নতুন ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি সিস্টেম 'OLIS'-এ কম্পিউটার মারফত বই পড়তে অসুবিধা হয়। কিন্তু এমনিতে অনেক নতুন বই তিনি পড়েন। এমন সময় ওঁর স্ত্রী হাসি দেবী, হাসিমুখে আমাদের চা পানের ব্যবস্থা করেছেন।

> আমাদের প্রজন্মের অনেকে যারা স্পষ্টবাদী নয়, যারা মাতৃভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে সাবলীল নই, তাদের তপনবাবুর মতো ব্যক্তিত্বের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

কথায় কথায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠল। অর্ঘ্য প্রশ্ন করল 'আগামী বিধানসভা ভোটে কী হবে?' উনি ঝটিকা উত্তর দিলেন যে তৃণমূল জিতবে। আমি তখন প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু চালাতে কি পারবে?' উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, তৃণমূল বিরোধী শক্তি হয়ে যতটা সফল, তত সফল শাসক হওয়া কঠিন। শাসন করা তৃণমূলের ধাতে নেই।'

'বাঙালনামা' বইটা ওঁর বাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আড্ডার শেষে সবিনয় অনুরোধ করলাম যদি তিনি বইটাতে তাঁর হস্তাক্ষর করেন। তিনি আগ্রহভরে লিখলেন 'মইদুল ইসলাম প্রীতিভাজনেষু তপন রায়চৌধুরী ৯/১১/১০'। কলকাতার বাড়ির ফোন নম্বর তিনি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে শীতের কয়েকটা মাস তিনি কলকাতায় থাকেন। এখনও ওঁর ফোন নম্বরগুলো যত্ন সহকারে সংরক্ষিত করে রেখেছি। সারা জীবন একটাই আক্ষেপ থেকে যাবে। ওঁর কলকাতার বাড়িতে কখনও ফোন করে সাক্ষাত করা হল না। আর এটাও জানা হল না যে আজ ওঁর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে কী অভিমত?

তপনবাবুর প্রজ্ঞা ও ইতিহাসচর্চা নিয়ে কিছু বলার মতো যোগ্যতা ও ধৃষ্টতা এই অধমের নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের প্রজন্মের অনেকে যারা স্পষ্টবাদী নয়, আমরা যারা মাতৃভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে সাবলীল নই, তাদের তপনবাবুর মতো ব্যক্তিত্বের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

চার দিকে যখন কিছু শঠ 'বুদ্ধিজীবী' ও 'বিদ্বজ্জন'দের দাপাদাপি দেখি যারা ভাঁওতাবাজ রাজনীতিবিদদের চাটুকারিতায় সিদ্ধহস্ত ও ব্যতিব্যস্ত, তখন তপনবাবুর মতো খাঁটি মানুষের চলে যাওয়াটা একটা বড়ো ক্ষতি। বোঝাই গিয়েছিল যে কৌলীন্য নিয়ে ওঁর কোনও উন্নাসিকতা ছিল না। সকলের সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন। আর তা না হলে নাতির বয়সী দুই ছোকরার সঙ্গে এত প্রাণবন্ত আড্ডা আর ক'জন দিতে পারেন, বলুন?

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক